ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 105-113
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.439

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'কালো পাথরে বুদ্ধ': মানব জীবনের টানাপোড়েন ও প্রতীকের অন্তর্লীন ভাষ্য

শিল্পী মণ্ডল, *গবেষিকা, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
ড. দেবলীনা দেবনাথ, *সহযোগী অধ্যাপিকা, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 02.04.2026; Accepted: 06.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

'Kalo Pathore Buddho' by Jhareswar Chattopadhyay is a profound and intellectually rich collection of contemporary Bengali short stories. The ten stories included in this volume artistically portray the multifaceted realities of life. They reflect the everyday struggles of middle-class and marginalized people, familial tensions, generational conflicts, and the subtle impacts of social change. In some stories, there is a clash of education and values; in others, silent breakdowns in relationships and the undercurrents of emotion are explored. Elsewhere, issues of displacement and existential crisis reveal deeper truths about human life.

The title story 'Kalo Pathore Buddho' carries a strong symbolic meaning. 'Buddha' represents knowledge, liberation, and peace, while the 'black stone' signifies the darkness, rigidity, and suffering within human hearts. Darkness resides within human beings, yet within that same space lies the potential for light. It is through this duality that the true essence of humanity is formed.

The stories vividly depict the struggles of ordinary people, poverty, deprivation, and small moments of joy. The author uses simple and lucid language to craft characters in such a way that readers can easily connect with them. There is no exaggeration or artificial dramatization; rather, the deeper significance of life is revealed through its natural flow. This article attempts to demonstrate, based on the ten stories in the collection, how these narratives become a profound exploration of the human psyche and social reality, inspiring readers to think deeply and enrich their sense of humanity.

Keywords: Social inequality, conflicts of human life, existential questions, symbolism, inner darkness, liberation and knowledge, realism etc

বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে এক নতুন প্রবণতার সূচনা হয়, যেখানে লেখকেরা চেনা শহুরে অভিজ্ঞতার বাইরে গিয়ে গ্রামাঞ্চল ও প্রান্তিক মানুষের জীবনকে তাঁদের রচনার মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করেন। এই সময়ের সাহিত্যিকরা বিশেষত শ্রমজীবী ও অবহেলিত মানুষের দৈনন্দিন সংগ্রামকে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেন, যার ফলে বাংলা গল্প-উপন্যাসে বাস্তবতার এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। সত্তর

ও আশির দশকের ছোটোগল্পকারদের মধ্যে এই প্রবণতা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, কারণ তাঁরা নির্দিষ্ট কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলকে কেন্দ্র করে সেখানে বসবাসকারী নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনযাপন, সংকট ও টানাপোড়েনকে সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত করেন। এই ধারার গুরুত্বপূর্ণ একজন কথাসাহিত্যিক হলেন ঋড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়; যিনি দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন এলাকার জীবনকে তাঁর লেখায় এক অনন্য স্বকীয়তায় তুলে ধরেছেন। নোনা জল, কাদামাটি, জোয়ার-ভাটায় প্রভাবিত জীবনপ্রণালী এবং প্রকৃতিনির্ভর জীবিকার নানা দিক তাঁর সাহিত্যকে গভীর বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করেছে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি চরিত্র ও ঘটনা নির্মাণ করেন- এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন; বাস্তবে যাদের দেখেন, তাদের জীবনকেই তিনি লেখায় রূপ দিতে চান।

যদিও প্রথমদিকে সুন্দরবন ভিত্তিক রচনার জন্যই তিনি অধিক পরিচিতি লাভ করেন, তবুও সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বিস্তৃত হয়েছে। এখন তাঁর রচনায় কেবল গ্রামীণ বা নদীবিধৌত অঞ্চলের জীবন নয়, বরং পরিবর্তনশীল সমাজের নানা জটিল দিকও প্রতিফলিত হয়। চরাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের সংগ্রাম, বনজ সম্পদের ওপর নির্ভরশীল জীবন, নৌযানকেন্দ্রিক জীবিকা যেমন উঠে আসে, তেমনই আধুনিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাবও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন- পুরনো জীবিকার অবসান, নতুন পেশার আগমন, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, কিংবা কাজের সন্ধানে দূর রাজ্যে পাড়ি দেওয়া শ্রমিকদের দুর্দশা তাঁর লেখায় বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সাম্প্রতিক বৈশ্বিক সংকটও তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে, যা তাঁর সাহিত্যকে সময়োপযোগী করে তুলেছে। লিখন ধারার এই পরিবর্তন সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য-

> "একজন শিল্পী-তিনি চিত্রকর, নাট্যকার, গায়ক, কবি, লেখক যাই হোন না কেন তাঁর সময়ের আগুন তাপ ছড়াবে, যন্ত্রণাবিদ্ধ করবে। বুভুক্ষ বেকারত্ব মুষড়ে দেবেই এবং সেগুলো তার শিল্পকর্মে আসতে বাধ্য। তাঁকে দমিয়ে রেখে বা পাশ কাটিয়ে সব শিল্পী তাঁদের শিল্প পক্রিয়ার মধ্যে থাকতে পারেন না এই চেতনায় শিল্পকর্মের অন্য চৈতন্য পৌঁছেদেয়।"[১]

ঋড়েশ্বরের লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সরলতা ও বাস্তবতার প্রতি নিষ্ঠা। তিনি অতিরঞ্জন বা নাটকীয়তার আশ্রয় নেন না; বরং পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতা এবং ভাষার স্বচ্ছতার মাধ্যমে জীবনের গভীর সত্য প্রকাশ করেন। তাঁর গল্পে গ্রামীণ সংস্কৃতি, লোকবিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার যেমন রয়েছে, তেমনই শহুরে জীবনের টানাপোড়েনও সমান গুরুত্ব পায়। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক- দাম্পত্য জীবন, মালিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব, কিংবা গৃহস্থ ও কর্মচারীর সম্পর্ক -এসবই তাঁর লেখায় বিশ্বাসযোগ্য ভাবে ফুটে ওঠে। যৌনতার বিষয়টিও তিনি বাস্তবতার আলোকে দেখিয়েছেন, যেখানে তা কখনো প্রয়োজনের তাগিদে, কখনো সামাজিক চাপে বা ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও তাঁর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। কৃষক আন্দোলন, খাদ্য সংকট, জমি সংক্রান্ত বিরোধ কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো বিষয়গুলি তাঁর গল্পে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষমতা এবং পরিবর্তনশীল সমাজকে গভীরভাবে অনুধাবনের দক্ষতার জন্য তাঁর সাহিত্য আজ শুধুমাত্র একটি অঞ্চলের বর্ণনা নয়, বরং সামগ্রিকভাবে সমাজের বিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়।

ঋড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'কালো পাথরে বুদ্ধ' গল্প সংকলনে মোট দশটি গল্প আছে। যথা- 'তীর্ণা ও পত্রলেখা', 'চাঁদ', 'ছাউনি', 'চোদ্দোশিকে', 'কালো পাথরে বুদ্ধ', 'বেয়ান', 'মেল ওয়ার্ড', 'রাঙা ঘোড়া', 'রাতের আমন্ত্রণ', 'ওড়না'। গল্পগুলিতে সমাজের জটিল সম্পর্ক, পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন, প্রজন্মগত দ্বন্দ্ব, সাম্প্রতিক সমস্যা এবং প্রান্তিক জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে গল্পকার সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষন করেছেন। এখানে মধ্যবিত্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও সীমাবদ্ধতার সংঘাত যেমন আলোচিত হয়েছে, তেমনি গ্রামীন ও প্রান্তিক মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম, দারিদ্র্য এবং সামাজিক চাপের গভীর প্রভাবও সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করা হয়েছে।

বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে নারীর অবস্থান- যেখানে তার নিপীড়ন, আত্মসংগ্রাম এবং আত্ম-মর্যাদাবোধ একসঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে। এই গল্পগুলির কেন্দ্রে রয়েছে ব্যক্তি ও সামাজিক সম্পর্কের দ্বান্দ্বিকতা। ব্যক্তি একদিকে সমাজের নিয়ম, মূল্যবোধ ও প্রত্যাশার দ্বারা অবদ্ধ, অন্যদিকে সেই কাঠামোর মধ্যেই নিজের স্বাধীন সত্তা ও পরিচয়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রাম করে। গল্প সংকলনের প্রথম গল্প 'তীর্ণা ও পত্রলেখা', পালক, শারদীয়া ২০২২ শে প্রকাশিত। এই গল্পে মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রেক্ষাপটে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঘিরে যে মতবিরোধ তৈরি হয়, তা আধুনিক সমাজের গভীর মানসিকতার প্রতিফলন। গল্পের শুরুতেই তীর্ণা নামক ছোট্ট মেয়েটিকে কোন স্কুলে ভর্তি করা হবে তাই নিয়ে সমস্যার উৎক্ষেপণ-

> "কদিন ধরে চলেছে, এ পরিবারে ফোর প্লাস মেয়েটিকে কোথায়, কোন স্কুলে ভর্তি করা যায়। মেয়ের মা বলছে, 'আমাদের ওপাশের বাড়ির অনুরাধাদির ছেলেকে অ্যানিবেসান্ত এল কেজি-তে দেবে।'..... নিজের মেয়েকে নিয়ে কী ভাবলে? তোমার বাবা আবার কী সব বলছে... শোনো গিয়ে..."[২]

তীর্ণার মা শ্রীরাধার ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ কেবল শিক্ষার মানের প্রশ্ন নয়; বরং এটি সামাজিক মর্যাদা, প্রতিযোগিতা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশ। শ্রীরাধা আরো অসহায় বোধ করে যখন তার ননদ পাপড়ি ফোনে জানায়-

> "..... তোমার লেখা... পত্রলেখাকে আট'ন দিন আগে কারমেল ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি করা হল।...."[৩]

মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তান্বিত হলেও তীর্ণার পিতা সমরেশ অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার বাস্তবতা উপলব্ধি করে বাস্তববাদী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চায়। তার দ্বন্দ্ব আধুনিক মধ্যবিত্ত জীবনের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য, যেখানে স্বপ্ন ও সামর্থ্যের মধ্যে এক অনিবার্য সংঘাত বিদ্যমান। পিতা-পুত্রের কথোপকথনে ধরা পড়ে তারই ইঙ্গিত-

> "কী আর বলার আছে? তীর্ণাকে ইংলিশ মিডিয়ামে অ্যাডমিট....সে তো যত উপরে উঠবে কস্টও হেভিয়ার হতে থাকবে। তোরা টানতে পারবি..? লকডাউন কাটিয়ে বেতন খুইয়ে এখন কী একটা সামান্য পাস। তাতে হবে?"[৪]

এই গল্পে শিক্ষা সম্পর্কিত দাদুর কথোপকথন একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক মাত্রা যুক্ত করে। পাঠক হিসেবে মনে হয়েছে এ যেন গল্পকারেরই শিক্ষা সম্পর্কিত মতামত। তীর্ণা ও পত্রলেখার দাদু শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসেবে মাতৃভাষা, পারিবারিক স্নেহ এবং মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেন। তার দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিকতার প্রতিযোগিতা মূলক প্রবণতার বিপরীতে একটি মানবিক ও শিকড় নির্ভর চেতনার প্রতিফলন। তীর্ণা ও দাদুর সম্পর্ক শিশু মনের বিকাশে পরিবারের গুরুত্বকে স্পষ্ট করে তোলে যা নৈতিক শিক্ষার এক বড় অঙ্গ। শিক্ষা কেবল প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি একটি সামগ্রিক অভিজ্ঞতা, যা আবেগ, সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত- এই বার্তাটিই গল্পকার গল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয় গল্প 'চাঁদ', উৎস- 'সৃষ্টির একুশ শতক' শারদ ২০২৪। এই গল্পে পারিবারিক সম্পর্কের অন্তর্গত আবেগগত জটিলতা এক সূক্ষ্ম শিল্পরূপে প্রকাশিত হয়েছে। অন্নপ্রাশনের মতো সামাজিক একটি অনুষ্ঠানের পটভূমিতে যে মানসিক টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়, তা মানবমনের গভীর স্তরকে উন্মোচিত করে। সোমা, সুরঞ্জন এবং পাপড়ির চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ভালোবাসা, ঈর্ষা, অপূর্ণতা এবং আত্মসমালোচনার বহুমাত্রিক প্রকাশ ঘটে। পাপড়ির একাকীত্ব এবং অতীত জীবনের ব্যর্থতা তাকে বর্তমানের আনন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে এবং এক বেদনাময় গভীরতা প্রদান করে। সোমার সুখী সংসার পাপড়ির কাছে যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি তা তার মধ্যে হীনমন্যতা ও ঈর্ষার জন্ম দেয়। সোমা অর্থাৎ সোমলতার মিনুমাসির সুন্দরী মেয়ে পাপড়ি স্বামী অজয়ের

মাতৃভক্তির কাছে স্ত্রী-প্রীতি অবহেলিত হওয়ায় চিরতরে স্বামী সংসার পরিত্যাগ করে চলে এসছে মায়ের কাছে। অতি সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও তার শূণ্যতা ভরাট করার জন্য একান্ত আপন হয়ে আর কোন পুরুষ আসেনি তার জীবনে। অন্য দিকে সোমা-

> "ফোর নাইন্টি এইট কাটিয়ে বছর দেড় দুই না পুরোতে ডিভোর্সি ছোকরা পুরুষ পেয়ে গেল 'সাদি ডট কমে'। সে আবার গড়ে নিল সব এখন পুরুষ নিয়ে ঘোরতর সংসারী বুক মুচড়িয়ে শ্বাস ছাড়ে পাপড়ি।..."[৫]

বোন সোমার ও তার সংসারের খুঁটিনাটি জানার আগ্রহ প্রকট হয়ে ওঠে তার মধ্যে। কিন্তু সোমার স্বামী সুরঞ্জনের স্ত্রী ও কন্যা স্নেহের বিবরণ শুনে পাপড়ির চোখ মুখ আনন্দের আলোকে ঝলকে ওঠে না বরং কালো মেঘের ছায়া ফুটে ওঠে। শিশু লুনা কার মত দেখতে হয়েছে মায়ের পরিবারের সদস্যদের মত না বাবার পূর্ব পুরুষদের মত তাই নিয়ে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়। শেষপর্যন্ত সুরঞ্জনের 'চাঁদ' সম্বোধনের মাধ্যমে শিশুটি একটি আশার প্রতীক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায় এবং সমস্ত দ্বন্দের ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ হয়। এই গল্পে শিশুটি নির্মল প্রতীক হিসেবে উপস্থিত, যে সব জটিলতার ঊর্ধ্বে থেকে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে।

'ছাউনি' গল্পে বাড়ি ধারণাটি একটি গভীর দার্শনিক তাৎপর্য বহন করে। এখানে বাড়ি কোন স্থির ভৌগোলিক সত্তা নয়; বরং এটি একটি মানসিক অনুভূতি, যা নিরাপত্তা, ভালোবাসা এবং আপনত্বের সঙ্গে যুক্ত। বাবা প্রণবেশ ও মা মণিকার সাথে ঘুরতে গিয়ে বাপন অস্থায়ী আশ্রয়কে নিজের বাড়ি হিসেবে অনুভব করে, তাই খিদে পাওয়ার কারণে সে বাড়ি যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। আসলে বাড়ি শব্দটির সাথে মানুষের আবেগ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রণবেশ বারবার, এই আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়ে যেখানে ঘুরতে যায় সেখানেই জমি কিনে বাড়ি বানানোর কথা ভাবে- সে পাহাড় হোক বা সমুদ্র। আসলে প্রণবেশের এই মানসিকতার মধ্য দিয়ে আপামর মানব জাতীর স্থায়ীত্বের আকাঙ্খা প্রস্ফুটিত হয়েছে। তবে ভুলে গেলে চলবেনা- বাসস্থানের জন্য যত বড় অট্টালিকা স্থাপিত হোক না কেন আমাদের শিকড় তো প্রকৃতিতে ন্যস্ত। প্রণবেশের কথাতেও এই গল্পে তা স্পষ্ট হয়-

> "প্রণবেশ হাঁপিয়ে চেঁচায়, জমি দেখতে হবে না...আ! .....আপাতত অবস্থানে থিতু, উঁহু। মানুষের আদি ঘরবাড়ি তো গুহা কন্দর!"[৬]

'চোদ্দোশিকে' গল্পে শহর ও গ্রামের মধ্যে একটি সেতু বন্ধন গড়ে ওঠে। রমেনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা গ্রামীন জীবনের সরলতা, আন্তরিকতা এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করি। শহরের যান্ত্রিক ও বিচ্ছিন্ন জীবন থেকে বেরিয়ে এসে সে এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি হয়, যেখানে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে সহযোগিতা, সৌজন্য এবং মানবিকতা বিদ্যমান। এই গল্পটি আধুনিকতার বিপরীতে একটি বিকল্প জীবনদর্শনের ইঙ্গিত দেয়, যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান মানুষের জীবনের একটি মৌলিক ভিত্তি। চোদ্দোশিকে নামক টলটলে নির্মল জলের ভেড়ি দেখতে আসা রমেন চপের দোকানী বৌ টির কাছে শুধু চা চাইলে তার প্রতিক্রিয়া-

> "শুধু চা.... হ্যাঁ গো বাবু, তোমার বাড়ির লোক কি শুধু এক কাপ চা ধরে দিয়েছে কখনও? দেয়.....?... বাম হাতের চেটোয় কাগজে মুড়ে দুখানা ক্রিমক্র্যাকার। চায়ের প্লেট খদ্দেরকে এগিয়ে দিয়ে বলে, কই ধরুন গো ভাই? এই নিন বিস্কুট দুটো, নিন?"[৭]

এই আন্তরিকতার ভাষা শহুরে মানুষ রমেনের কাছে ঠিক স্পষ্ট না হলেও আমরা জানি গ্রামের মা বোনেরা, দিদিরা ঠিক এমনই স্নেহময়ী হয়ে থাকেন।

গল্প সংকলনের নাম গল্প 'কালো পাথরে বুদ্ধ'- এর উৎস সৃষ্টির একুশ শতক (উৎসব) ২০২৩। এই গল্পটিতে সময়, স্মৃতি, দারিদ্র্য এবং ক্ষমতার সম্পর্ক এক জটিল কাঠামোর মধ্যে উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে অতীত ও বর্তমানের দ্বৈততা একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। প্রীতিময়ের স্মৃতি চারণের মাধ্যমে একটি জনপদের পরিবর্তনশীল রূপ উন্মোচিত হয়, যা আধুনিকতার প্রভাব এবং প্রান্তিক মানুষের জীবনের বাস্তবতাকে একসঙ্গে তুলে ধরে। ঠিক কতটা অসহায় হলে পিতা-মাতা তার সন্তানদের কাছছাড়া করতে বাধ্য হয় তা এই গল্পে নন্দী সর্দারের কথার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে-

> "মেয়ে দুটো ফুঁপিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদে.... বাপ ভিজে চোখে বলে, অমন গাঙপাড় পুলিশের জালা থেকে তোদের বাঁচাতে পারবুনিরে মা! ... বাঁচতে শিখরে মায়েরা, বাপের কাপড় ধরে ভাই ফ্যাল ফ্যাল তাকিয়ে।..."[৮]

এই গল্পে রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রভাবও সুস্পষ্ট। পুলিশি অত্যাচার, চাঁদাবাজি এবং উচ্ছেদের ভয় প্রান্তিক মানুষের জীবনে এক স্থায়ী অনিশ্চয়তা তৈরি করে। প্রীতিময় ও তনুশ্রীর কথোপকথনে পাওয়া যায় তার ইঙ্গিত-

> "..... আচ্ছা কাকু, আমাদের এই কষ্টের এই দোকান টুকুতে কত আর বেচাকেনা। দু-চারমাস অন্তর মেজ নেতা বড় নেতার নাম করে বলে, এই তনু হাজার খানেক টাকা দে। বড় পোলের ওপারে রক্তদান শিবির হবে, রক্তদাতাদের কলা আপেল এক গেলাস করে দুধের ব্যবস্থা। কিছু ডোনেট কর। ছ'মাস যায় বড় নেতা এক সন্ধের হাওয়ায় গাঙপাড় চক্কর দিয়ে দোকানের সামনে দাঁড়ায়, কিরে দোকানটা সরালি না। ....গলা বাড়িয়ে বলে, পিসি ওদের দু প্লেট ডিম টোষ্ট আর চা দাও। খাওয়া মিটলে উঠে যায় যে পথে এসেছিল সেই পথে। আমি বলি, ও টোটন দাম? উত্তর, এরা মেজদার লোক!...."[৯]

এই অনিশ্চয়তার মধ্যেও বেঁচে থাকার ইচ্ছা এবং আত্ম নির্ভরতার বোধ গল্পটিকে একটি গভীর মাত্রা প্রদান করে। কালো পাথরের বুদ্ধ ও তার বাণী 'আত্মদীপ ভবঃ'- এখানে একটি দার্শনিক উপসংহার হিসেবে উপস্থিত, যা ব্যক্তি মানুষকে নিজের ভেতরের শক্তি ও আলোর সন্ধান করতে উদ্বুদ্ধ করে।

'বেয়ান' গ্রামীন পেক্ষাপটে নির্মিত একটি গল্প- দারিদ্র, সামাজিক চাপ এবং সম্পর্কের জটিলতা তীব্রভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এই গল্পে। বুলা বাগের জীবন সংগ্রাম, মাতৃত্বের ত্যাগ এবং সামাজিক প্রত্যাশার সংঘাত অত্যন্ত নির্মমভাবে ফুটে উঠেছে। এখানে নারীর শরীরকে একটি সামাজিক সমস্যার সমাধান হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতা পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার এক নির্মম দিককে উন্মোচিত করে। বুলার অবস্থান কেবল ব্যক্তিগত নয়; বরং এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন, যেখানে নারীর স্বাধীনতা ও মর্যাদা প্রায়শই প্রশ্ন বিদ্ধ হয়। বুলার মেয়ে 'পুনি'র তিন বছর বিয়ে হলেও শারীরিক সমস্যার কারণে সন্তান হয় না, তাই তার শাশুড়ি বেয়ান অর্থাৎ বুলা বাগকে বলে মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু বিবাহিত মেয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এলে সমাজের যে বাঁকা চাহনি ও ক্ষুরধার কথার বাণ, উপরন্তু অভাবের সংসারে আর একটি পেটের অন্ন সংস্থান সব মিলিয়ে জীবন-যাপন অসহ্য হয়ে ওঠে। তাই জীবনের চরম অপমান জনক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় বুলা, মেয়ের ঘরকে পোক্ত করতে নিজে ধরা দেয় জামাই এর লালসায়। এই বশ্যতা স্বীকার কেবলমাত্র জামাই-শাশুড়ির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না বা কেবল পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কাছেও নয়; এই হার সামাজিক অনিশ্চয়তার কাছে, দারিদ্রের কাছে, আশ্রয় হীনতার কাছে।

মেল ওয়ার্ড' গল্পটি মূলত গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের জীবনসংগ্রাম, অনিশ্চয়তা এবং সেই পরিস্থিতির মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তনকে তুলে ধরে। মধু হালদার একজন দিনমজুর, যে সামান্য আয়ের জন্য প্রতিদিন কঠোর

পরিশ্রম করে এবং ভালো মজুরির আশায় দূরে কাজ করতে যাওয়ার কথাও ভাবে—"গরমেন্টের জব কার্ডয়ের চেয়ে মজুরি বেশি তো বন্ধু?"[১০] -এই সংলাপ থেকেই বোঝা যায় জীবিকার তাগিদ কতটা প্রবল। কিন্তু হঠাৎ একটি ঝগড়ার মধ্যে পড়ে জং ধরা পেরেক লাগানো বাঁশের আঘাতে সে গুরুতর আহত হয় যা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। হাসপাতালে চিকিৎসার সময় তার স্ত্রী লহরির অসহায়তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বামীর মৃত্যুর পর লহরি বাঁচার জন্য শহরে গিয়ে অন্যের বাড়িতে কাজ শুরু করে—"পরের মাস পহেলা থেকে লহরি হাসপাতাল শহরে দু-বাড়ি রাঁধে"[১১]—এবং ধীরে ধীরে আলাউদ্দিনের সঙ্গে তার এক নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যেখানে নির্ভরতা, স্নেহ ও একাকীত্বের মিশ্রণ দেখা যায়। কিন্তু সমাজ এই পরিবর্তনকে সহজভাবে নেয় না, বরং কটাক্ষ করে। তার জামাই রেনুপদ ও মেয়ে বাণীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে- "...ব্যাপারীর উত্তর, তোর নতুন শ্বশুর হয়েছে"[১২]—যা দেখায় সামাজিক মূল্যবোধ ও বাস্তব জীবনের প্রয়োজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব। সব মিলিয়ে গল্পটি বোঝায় যে দারিদ্র্য ও বেঁচে থাকার লড়াই মানুষের জীবনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে সম্পর্ক, নীতি ও সামাজিক ধারণা সবই পরিস্থিতির সঙ্গে বদলে যেতে বাধ্য হয়।

'রাঙা ঘোড়া' গল্পটি মূলত এক দরিদ্র গ্রামীণ সমাজের বাস্তব জীবনচিত্র, যেখানে হাসিনা নামের এক বিধবা নারীর জীবন সংগ্রামকে কেন্দ্র করে মানুষের সম্পর্ক, দারিদ্র্য, ধর্মীয় ভেদাভেদ এবং বেঁচে থাকার তাগিদ খুব গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। গল্পের শুরুতেই দেখা যায়, হাসিনা স্বামী হারিয়ে ছোট মেয়েকে নিয়ে বাবার বাড়িতে ফিরে আসে— "শাসমলবাঁধে শেখদের মেজমেয়ে হাসিনা বিধবা হল। ক'মাস পরে বাপ মোজাম্মেল শেখের দাওয়ায় ওঠে।"[১৩] এই ফিরে আসা শুধু আশ্রয়ের জন্য নয়, বরং নতুন করে বাঁচার লড়াইয়ের শুরু। সে গরুর দেখাশোনা করে, সংসারের কাজ সামলায়, আর তার ছোট মেয়ে মোমিনা দাওয়ায় খেলাধুলা করে— এইসব ছোট ছোট দৃশ্যের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ জীবনের সরলতা ও কষ্ট একসঙ্গে ফুটে ওঠে। এই সমাজে জমির মালিক আর ভাগচাষিদের মধ্যে যে শোষণের সম্পর্ক, সেটিও গল্পে স্পষ্ট- যারা জমি চাষ করে, তারাই সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত। এই প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি উঠে আসে— "গরিবের আবার জাত? ..... সে হিঁদু হোক মুছুনমান হোক একটাই জাত গরিব।"[১৪] এই সংলাপটি গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবনা, যেখানে ধর্ম বা জাত নয়, দারিদ্র্যই মানুষের প্রকৃত পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়। হাসিনার মনেও এই কথা নাড়া দেয়-সে ভাবে, খিদের জ্বালা, মনের মায়া, শরীরের তাড়না সব মানুষেরই এক। এরপর গল্পে আসে একটি মোড়, যখন তাদের বলদ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং কবিরাজ ভূধর মাঝিকে ডাকা হয়। ভূধরের আগমন শুধু চিকিৎসক হিসেবে নয়, বরং হাসিনার জীবনে এক নতুন সম্পর্কের সূচনা। ভূধরের নিজের স্ত্রী অসুস্থ, আর হাসিনা একা- এই দুই একাকিত্ব মিলেই তাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরে দেখা যায়, সামাজিক নিয়ম ভেঙে হাসিনা তাকে বিয়ে করে- একজন মুসলিম নারী হিন্দু রীতিতে বিবাহ করছে। এতে সমাজের বিরূপ প্রতিক্রিয়াও আসে- তবুও তারা নিজেদের মতো করে সংসার গড়ে। রাঙা ঘোড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হিসেবে থাকে- এটি ভূধরের জীবিকা, চলার শক্তি এবং হাসিনার সঙ্গে তার সম্পর্কের বাহন। কিন্তু এই চলমান জীবনের হঠাৎই অবসান ঘটে, যখন রাঙা ছুটতে ছুটতে হোঁচট খেয়ে উলটে পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে এবং সাথে ভূধরের মৃত্যু হয়। এই আকস্মিক মৃত্যু আবার হাসিনাকে একা করে দেয়। শেষের দিকে আমরা দেখি, সময় বদলেছে—গ্রামে রাস্তা হয়েছে, মোবাইল এসেছে, কিন্তু হাসিনার জীবনের একাকিত্ব কমেনি। পুরো গল্পটি তাই একদিকে দরিদ্র মানুষের সংগ্রাম, অন্যদিকে নারী জীবনের জটিলতা, ধর্মের ভেদরেখা ভাঙা, আর শেষ পর্যন্ত মানুষের একাকিত্ব—এই সবকিছুর এক বাস্তব ও নির্মম চিত্র তুলে ধরে।

'রাতের আমন্ত্রণ' এই গল্পটি মূলত অতীত স্মৃতি, সময়ের পরিবর্তন, হারিয়ে যাওয়া সম্পর্ক এবং এক ধরনের রহস্যময় আবেগের মিশেলে গড়ে ওঠা। পুরো কাহিনির কেন্দ্রে আছে রমেনবাবু— একজন প্রবীণ মানুষ, যিনি এক সন্ধ্যায় হঠাৎ করে অতীতের সঙ্গে এমনভাবে সংযোগ স্থাপন করেন, যেন সময়ের সীমানা মুছে যায়। গল্পের শুরুতেই আমরা দেখি, রমেনবাবু এক শীতের সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরছেন। পরিবেশটি খুব বাস্তব— মফস্বলের রাস্তা, ম্লান আলো, পরিচিত চলাচল। কিন্তু এই বাস্তবতার মাঝেই হঠাৎ এক অস্বাভাবিকতা আসে, যখন পাপড়ি এসে তার হাত ধরে বলে সে তাকে চিনতে পেরেছে কিনা। এই মুহূর্ত থেকেই গল্পটি বাস্তব থেকে ধীরে ধীরে স্মৃতি ও অতীন্দ্রিয়তার দিকে সরে যেতে থাকে। পাপড়ির উপস্থিতি শুধু একটি চরিত্রের উপস্থিতি নয়, বরং সে যেন অতীতের দরজা খুলে দেয়। রমেনবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন তারা কবে এখানে এসেছে- এখানেই বোঝা যায়, এই দেখা হওয়াটা হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিত। পাপড়ির হাতের স্পর্শ, তার কণ্ঠস্বর— সবকিছু রমেনকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় বহু বছর আগের সেই শৈশব-কৈশোরের সময়ের মধ্যে। এরপর গল্পটি দীর্ঘ ফ্ল্যাশব্যাকে প্রবেশ করে, যেখানে মধুসূদন মণ্ডল, যুথিকা, পাপড়ি— এই পরিবারটির জীবনচিত্র ফুটে ওঠে। সেই সময়ের দারিদ্র্য, খাদ্যাভাব, 'পি এল ৪৮০' প্রকল্পের উল্লেখ— সব মিলিয়ে এক কঠিন সামাজিক বাস্তবতা উঠে আসে। মধুসূদন মণ্ডল চরিত্রটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি একদিকে সাধারণ গ্রামীণ মানুষ, অন্যদিকে তার মধ্যে রয়েছে স্মৃতি ও আবেগের গভীরতা। তার শৈশব, গ্রাম, জমি, সম্পর্ক- সবকিছু তার মনে গেঁথে আছে। গল্পে বারবার প্রকৃতি, জমি, খাল, জোয়ার— এইসব চিত্রের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে মানুষের জীবনের সঙ্গে মাটির গভীর সম্পর্ক। শিশুদের খেলা 'কুমির ডাঙা'-গল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। এই খেলাটি শুধু খেলা নয়, বরং শৈশবের নির্ভেজাল আনন্দ, সম্পর্কের সরলতা এবং সেই সময়ের নিষ্পাপ সরলতার প্রতীক।

যুথিকার চরিত্রে আমরা এক অন্যরকম আবেগ দেখি। তার অতীতের স্মৃতি, বিশেষ করে শিবু নামের এক সহপাঠীর কথা- এটা প্রেম নয়, কিন্তু এক ধরনের শ্রদ্ধা, টান, যা সময়ের সঙ্গে হারিয়ে যায় না। গল্পের শেষ অংশে আবার আমরা বর্তমান সময়ে ফিরে আসি, যেখানে পাপড়ি রমেনকে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। কিন্তু এখানে একটা অদ্ভুত বিষয় লক্ষণীয়— সবকিছু যেন স্বাভাবিক, অথচ কোথাও একটা অস্বস্তি, অচেনা অনুভূতি কাজ করে। সবচেয়ে রহস্যময় মুহূর্ত আসে একেবারে শেষে। যখন রমেন চলে যাচ্ছেন, পাপড়ি তার হাত ধরে বলে— চেষ্টা করেও সে তার বাবা-মাকে বাঁচাতে পারেনি। এই সংলাপটি পুরো গল্পের অর্থ বদলে দেয়। এখানে বোঝা যায়, মধুসূদন ও যুথিকা আর বেঁচে নেই। অর্থাৎ, যাদের স্মৃতি আমরা এতক্ষণ ধরে দেখছিলাম, তারা আসলে অতীতের মানুষ। তখন প্রশ্ন ওঠে— পাপড়ির এই উপস্থিতি কি বাস্তব, নাকি সে এক স্মৃতির প্রতিচ্ছবি? এই অস্পষ্টতাই গল্পের মূল শক্তি। পাঠক নিশ্চিত হতে পারে না, ঘটনাগুলো বাস্তবে ঘটছে, নাকি রমেনের মনের ভেতরে। সব মিলিয়ে, 'রাতের আমন্ত্রণ' একটি স্মৃতিনির্ভর, আবেগঘন এবং খানিকটা অতীন্দ্রিয় গল্প, যেখানে সময়, মানুষ, সম্পর্ক— সবকিছু একসঙ্গে মিশে গেছে। এটি দেখায়, মানুষ যতই বর্তমানের মধ্যে বাস করুক, তার ভেতরে অতীত সবসময় জীবন্ত থাকে; কখনও স্পষ্ট, কখনও আবছা, কখনও বা এক রহস্যময় আমন্ত্রণের মতো ফিরে আসে।

'ওড়না' গল্পে বারো ক্লাসের পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর সুধেন্দুর যে গভীর শূন্যতার অনুভূতি তৈরি হয়, সেটিই গল্পের আবহ তৈরি করে দেয়। লেখক লিখেছেন, "বারো ক্লাসের পরীক্ষা দিয়ে সুধেন্দু পুরকাইতের বুকের ভেতর বড্ড ফাঁকা ঠেকে।"[১৫] এই 'ফাঁকা' শব্দটি কেবল পরীক্ষার পর অবসর সময়ের ইঙ্গিত নয়, বরং কৈশোর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে প্রবেশের এক মানসিক দোলাচলের প্রকাশ। এরপর লেখক আমাদের নিয়ে যান অতীতের একটি স্মৃতিতে, যেখানে অনিতার সঙ্গে সুধেন্দুর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ তৈরি হয়। পিসির বাড়িতে ঘুরতে এসে রাখি পূর্ণিমায় সুধেন্দুকে একটি চকমকে রাখি পরিয়ে দেয়- এই দৃশ্যটি আপাতদৃষ্টিতে

একেবারেই নিষ্পাপ, ভাই-বোনের সম্পর্কের উৎসব। কিন্তু এই সরলতার আড়ালেই লুকিয়ে থাকে এক অদ্ভুত আকর্ষণ। সুধেন্দুর মনে অনিতাকে নিয়ে অন্যরকম অনুভূতির জন্ম হয়। এই অনুভূতির কারণেই সুধেন্দুর মনে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। সে পড়াশোনায় মন দিতে চাইলেও পারে না- বই খুলে বসেও বারবার মন অন্যদিকে চলে যায়। এই অবস্থাটি কৈশোরের একেবারে স্বাভাবিক মানসিক অবস্থা, যেখানে দায়িত্ব ও আবেগের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। সুধেন্দু বুঝতে পারে না, তার এই অস্থিরতার উৎস কী, কিন্তু পাঠক সহজেই বুঝতে পারে যে এর কেন্দ্রে রয়েছে অনিতা।

এরপর নদীর ধারে তাদের একসঙ্গে হাঁটার দৃশ্যটি গল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁক। সুধেন্দু স্বপ্ন দেখে, একটু এগোতে চায়, সে এই সম্পর্কটিকে আর ভাই-বোনের সীমার মধ্যে রাখতে চায় না, বরং নিজের ভালোবাসাকে প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু অনিতার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তার বাস্তববোধ, সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতা এবং সম্পর্কের সীমা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ফুটে ওঠে। সে বুঝিয়ে দেয়, এই সম্পর্ককে প্রেমে রূপান্তর করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর সুধেন্দুর আচরণ- নিজের হাতে ছুরি চালিয়ে রক্ত বের করা একটি চরম আবেগপ্রবণ প্রতিক্রিয়া। এই দৃশ্যটি তার ভিতরের অস্থিরতা ও হতাশার বহিঃপ্রকাশ। সে যেন নিজের অনুভূতিকে প্রমাণ করতে চায়, কিন্তু এই প্রমাণের ভাষা অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক ও বেদনাদায়ক। ঠিক এই মুহূর্তেই গল্পের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতীকটি সামনে আসে— ওড়না। দোকানি দিদি বলে, "তোর ওড়নাটা ছেঁড় রে, মা।"[১৬] এই ওড়না শুধু একটি কাপড় নয়; এটি নারীত্ব, শালীনতা ও সামাজিক সম্পর্কের প্রতীক। অনিতা যখন ওড়না ছিঁড়ে সুধেন্দুর হাত বাঁধতে যায়, তখন সেটি দ্রৌপদী ও কৃষ্ণের পুরাণকথার প্রতিধ্বনি তৈরি করে। অর্থাৎ, সম্পর্কটি প্রেমের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে বন্ধুত্বের সম্পর্কে পরিণত হয়। এইভাবে গল্পটি এক অসম্পূর্ণ প্রেমের কাহিনি হয়ে ওঠে, যেখানে আবেগ আছে, টান আছে, কিন্তু সামাজিক বাস্তবতা ও সম্পর্কের সীমারেখা সেই প্রেমকে পূর্ণতা পেতে দেয় না। সুধেন্দুর ভালোবাসা প্রকাশ পায়, কিন্তু তা গ্রহণযোগ্যতা পায় না; অনিতা বোঝে, কিন্তু সে নিজের অবস্থান থেকে সরে আসে না। শেষ পর্যন্ত 'ওড়না' হয়ে ওঠে প্রেমের নয়, বরং সম্পর্ককে সংযত ও সংরক্ষিত রাখার প্রতীক।

এইসব গল্পগুলিকে একত্রে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সমকালীন বাংলা ছোটগল্প ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ককে বহুমাত্রিকভাবে উপস্থাপন করে। পরিবার এখানে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান, যেখানে ভালোবাসা, দ্বন্দ্ব, আশা এবং হতাশা একসঙ্গে অবস্থান করে। প্রজন্মগত পার্থক্য, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা এবং সামাজিক প্রত্যাশা সম্পর্কগুলিকে জটিল করে তোলে। নারীর অবস্থান এই গল্পগুলিতে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বুলা, লহরি, হাসিনা, অনিতা, তনুশ্রী-প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে নিজেদের অবস্থান নির্ধারণ করে। তারা কখনো পরিস্থিতির শিকার, আবার কখনো সেই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই চরিত্রগুলির মাধ্যমে বোঝা যায় যে নারীর জীবন কেবল সামাজিক বিধিনিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়; বরং তারা সেই বিধিনিষেধের মধ্যে থেকেই নতুন সম্ভাবনার সন্ধান করে। প্রকৃতির উপস্থিতিও এই গল্পগুলিতে গভীর তাৎপর্য বহন করে। নদী, সমুদ্র, মাটি, আকাশ- এই সমস্ত উপাদান মানুষের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত এবং তাদের অস্তিত্বকে একটি বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে। সমকালীন দৃষ্টিকোণ থেকে এই গল্পগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এগুলিতে উত্তরাধুনিকতার বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে উপস্থিত। জীবনের অনিশ্চয়তা, মূল্যবোধের পরিবর্তন, পরিচয়ের সংকট এবং বাস্তবতার বহুমাত্রিকতা এই গল্পগুলির মূল বৈশিষ্ট্য। একই সঙ্গে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেও এই গল্পগুলির গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এখানে নারীর অভিজ্ঞতা, সংগ্রাম এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা কেন্দ্রীয়ভাবে উঠে এসেছে। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই গল্পগুলি মধ্যবিত্ত ও প্রান্তিক জীবনের অন্তর্গত বৈষম্য, ক্ষমতার কাঠামো এবং সামাজিক সম্পর্কের প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করার সুযোগ প্রদান করে। আসলে এই গল্পসমূহ

সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারাকে প্রতিনিধিত্ব করে, যেখানে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক বহুমাত্রিক, জটিল এবং পরিবর্তনশীল। এই গল্পগুলি আমাদের শেখায় যে জীবনের প্রতিটি স্তরে দ্বন্দ্ব, কষ্ট এবং অনিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে আশা, ভালোবাসা এবং নতুন সম্ভাবনা। মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি তার নিজের ভেতরেই নিহিত এই চিরন্তন সত্যই এই গল্পগুলির অন্তর্নিহিত সুর হিসেবে প্রতিভাত হয়।

তথ্যসূত্র:

১. চট্টোপাধ্যায়, ঋড়েশ্বর। 'নিজের দিকে ফিরে'। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কেন লিখি', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ২০০০, পৃষ্ঠা: ২২৭।

২. চট্টোপাধ্যায়, ঋড়েশ্বর। 'কালো পাথরে বুদ্ধ'। 'তীর্ণা ও পত্রলেখা', দেজ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০২৫, কলকাতা পৃষ্ঠা: ৯।

৩. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৫।

৪. তদেব, পৃষ্ঠা: ১১।

৫. চট্টোপাধ্যায়, ঋড়েশ্বর। 'কালো পাথরে বুদ্ধ'। 'চাঁদ', দেজ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০২৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ২০।

৬. চট্টোপাধ্যায়, ঋড়েশ্বর। 'কালো পাথরে বুদ্ধ'। 'ছাউনি', দেজ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০২৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ২৮।

৭. চট্টোপাধ্যায়, ঋড়েশ্বর। 'কালো পাথরে বুদ্ধ'। 'চোদ্দোশিকে', দেজ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০২৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ৩৪।

৮. চট্টোপাধ্যায়, ঋড়েশ্বর। 'কালো পাথরে বুদ্ধ'। 'কালো পাথরে বুদ্ধ', দেজ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০২৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ৫১।

৯. তদেব, পৃষ্ঠা: ৫৬।

১০. চট্টোপাধ্যায়, ঋড়েশ্বর। 'কালো পাথরে বুদ্ধ'। 'মেল ওয়ার্ড', দেজ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০২৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ৭১।

১১. তদেব, পৃষ্ঠা: ৭৫

১২. তদেব, পৃষ্ঠা: ৭৬

১৩. চট্টোপাধ্যায়, ঋড়েশ্বর। 'কালো পাথরে বুদ্ধ'। 'রাঙাঘোড়া', দেজ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০২, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ৭৮।

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা: ৮০।

১৫. চট্টোপাধ্যায়, ঋড়েশ্বর। 'কালো পাথরে বুদ্ধ'। 'ওড়না', দেজ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০২, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ১৩৫।

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৪২।